cZbgLx gmwjg RwZt
DÌv‡bi KvR ïi“ n‡e wKfv‡e?

মুসলমানদের পতনযাত্রা বহু শত বছর পূর্বে শুরু হলেও এখনও থামেনি। কিন্তু যারা পতনমুখী এ জাতির উত্থান নিয়ে চিন্তিত তাদের কাছে প্রশ্ন হলো উত্থানের কাজ শুরু করতে হবে কোত্থেকে? এব্যাপারে আল্লাহর হেদায়েতই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। কোরআনপাকে মানবজাতির জন্য আল্লাহতায়ালার যেটি প্রথম নির্দেশ সেটি নামায-রোজা-হজ্ব-যাকাত বা জিহাদ নয়। বরং ইকরা বা পড় অর্থাৎ জ্ঞানবান হও। জ্ঞান অর্থ আলো। আর অজ্ঞতা হলো অন্ধকার। অন্ধকার সুযোগ করে দেয় হীংস্র হায়েনাদের, তথা মানুষের দুষমনদের। তারা এমন অবস্থারই অপেক্ষায় থাকে। শুধু পথচলা নয়, যে কোন সৃষ্টিশীল কাজের জন্য চাই আলোকিত পরিবেশ। অন্ধকার যেমন রাতের পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আচ্ছন্ন করতে পারে মনের ভুবনকেও। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, শিষ্ঠ-অশিষ্ঠ এসবের পার্থক্য বুঝবার জন্য সূর্যের আলো নয়, প্রয়োজন মনের আলোর। বস্তুতঃ বিশ্বের বহু পাপাচার হয় সূর্যের আলোতেই। সূর্যের সে আলো কদর্যতা বা পাপপংকিলতা চিনতে সাহার্য করে না। মনের আলো হলো জ্ঞান। পবিত্র কোরআনে পাকে বর্ণীত হয়েছে, আল্লাহপাক ঈমানদারের বন্ধু। তিনি তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান, আর যারা ঈমানহীন তাদের বন্ধু হলো শয়তান। শয়তান তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এখানে যে আলোর কথা বলা হয়েছে সেটি মনের আলো। আর সে আলো হলো জ্ঞান। সূর্যের আলোয় সত্য-মিথ্যা বা ন্যায়-অন্যায় চেনা যায় না। এজন্য আলোকীত মন চাই। আল্লাহতায়ালা তার মোমেন বান্দাকে সেই আলোকীত মন দিয়ে পুরস্কৃত করেন। আলোকীত মনের কারণে যে অন্যায়, অসত্য ও অসুন্দরকে মরুর নিরক্ষর মুসলমানরা আজ থেকে ১৪ শত বছর পূর্বে দেখতে পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগনও তা দেখতে পায় না। এ কারণেই পাশ্চাত্য দেশে ব্যভিচার, ফ্রি-সেক্স, হোমোসেক্সুয়ালিটি, মদপানের মত আদিম পাপাচারও আজ পাপাচার রূপে গণ্য হচ্ছে না। বরং সেগুলো সমাজের সভ্য আচার রূপে গণ্য হচ্ছে। ১৪ শত বছর পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা যেখানে ভৃত্যকে উঠের পিঠে চড়িয়ে উঠের রশি নিজে টেনেছেন আজ সেখানে পাশ্চাত্য দেশের শাসকেরা মানুষের উপর প্রভুত্বকে নিজেদের সংস্কৃতিতে পরিণত করেছে। জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে আজ যাদের বিস্তর গর্ব কিছু দিন আগেও তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গলায় রশি বেধে মানুষকে গবাদী পশুর ন্যায় হাটে বাজারে তুলেছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে মন-রাজ্যে অন্ধকারের কারণে।

ইসলামে জ্ঞানার্জন প্রতিটি নরনারীর উপর ফরজ। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর এটিই ইসলামের প্রথম ফরজ। অন্যান্য ফরজ গুলো এসেছে তার পর। তাছাড়া জ্ঞানার্জন ছাড়া অন্যান্য ফরজগুলো পালনও সম্ভব নয়। ইসলাম খৃষ্টান ধর্ম বা হিন্দু ধর্মেও ন্যায় নয় যে গীর্জার যাযক বা মন্দিরের ঠাকুরকে দিয়ে উপাসনা করিয়ে নেওয়া যাবে। ইসলামে এবাদতের দায়িত্ব ব্যক্তির নিজস্ব, কাউকে দিয়ে এ দায়িত্ব পালন হওয়ার নয়। তাই ইসলামের খলিফাকেও প্রজার ন্যায় একই ভাবে নামাজ রোযা ও অন্য এবাদত করতে হয়েছে। জিহাদ শুধু সৈনিকদেরই নয় তাকেও করতে হয়েছে। আর অজ্ঞতা নিয়ে এবাদত হয় না, এবাদতের সামর্থ অর্জনে জ্ঞানার্জন জরুরী। ইসলামে জ্ঞানার্জন এজন্যই বাধ্যমূলক। ইসলামে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য শুধু পড়া, লেখা বা হিসাব নিকাশের সামর্থ বৃদ্ধি নয়, বরং মনের অন্ধকার দূর করা। ব্যক্তির দেখবার ও ভাববার সামর্থে উন্নতি আনা। মনের অন্ধকার নিয়ে আল্লাহর কুদরতকে দেখা যায় না, দেখা যায় না তাঁর মহান সৃষ্টিরহস্যও। জাহেল ব্যক্তি এজন্যই আল্লাহর অসীম সৃষ্টি জগতের মাঝে বসেও আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ইসলাম মানুষের মনের এ অন্ধকার দূর করতে চায়। তাই জ্ঞানার্জন ইসলামে নিজেই কোন লক্ষ্য নয়, বরং এটি লক্ষ্যে পৌছবার মাধ্যম মাত্র। আর লক্ষ্যটি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর এটিই তার জীবন লক্ষ্য। চালক যেমন তার গাড়ীকে চালনার পূর্বে লক্ষ্যকে জেনে নেয় তেমনি আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছবার এ যাত্রাপথে একজন মুসলমানও সঠিক রোড-ম্যাপকে

জানতে চায়। আর সে রোড-ম্যাপের সঠিক জ্ঞানলাভই মুসলমানের জ্ঞানার্জনের মূল লক্ষ। রোড-ম্যাপের এ প্রাথমিক জ্ঞানলাভটুকু সঠিক না হলে জীবনে বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি আসবে সেটাই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক অগ্রগতির পরও অসংখ্য মানব যে আজ সীমাহীন বিভ্রান্তির স্বীকার তার মূল কারণ সে রোড ম্যাপ নিয়ে অজ্ঞতা।

ইসলামে জ্ঞানের অর্থ এই নয় যে তাতে শুধু উপার্জনের সামর্থ বাড়বে বা কলাকৌশলে দক্ষতা বাড়বে। জ্ঞানের মোদ্দা কথা হলো তাতে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে। যে জ্ঞান ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টিতে ব্যর্থ সে জ্ঞান জ্ঞানই নয়। এটি কোন কারিগরী দক্ষতা বা ট্রেড স্কিল হতে পারে তবে সেটি যথার্থ জ্ঞান বা ইলম নয়। অনেক পশুপাশি বা জীবজন্তুরও বহু দক্ষতা থাকে যা মানুষেরও নেই। কুকুর যেভাবে লুকানো মাদক দ্রব্য বা অপরাধীকে সনাক্ত করে তা মানুষ বা মানুষের তৈরী আধুনিক যন্ত্রের নেই। কিন্তু এর জন্য তাকে জ্ঞানী বলা হয় না। আল্লাহ পাক কোরআন মজিদে বলেছেন একমাত্র জ্ঞানীরাই আমাকে ভয় করে। এ থেকে এটিই বুঝা যায় আল্লাহপাক জ্ঞান বলতে কি বুঝাতে চান। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই তার মধ্যে ইলমও নেই। আল্লাহপাক কোরআন মজীদে অন্যত্র বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্ঠি ও রাত-দিনের ঘুর্ণায়নের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার বিশাল গ্রন্থ হলো বিশ্ব চরাচর, এ গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য আয়াত বা নিদর্শন। এবং জ্ঞানী একমাত্র তারাই যারা স্রষ্টার সে গ্রন্থ পাঠের সামর্থ রাখে। নানা ভাষার গ্রন্থ পাঠের যাদের সামর্থ রয়েছে অথচ আল্লাহর এ গ্রন্থ পাঠে যোগত্য নেই তাদেরকে আর যাই জ্ঞানী বলা যায় না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানী তিনিই যার পুস্তক পাঠের সামর্থ না থাকলেও আল্লাহর আয়াত - তা কোরআনের হোক বা বিশ্বচরাচরে ছড়ানো ছিটানো নিদর্শন হোক - তা পাঠের সামর্থ আছে। এ জ্ঞানটুকু না থাকলে সিরাতুল মোস্তাকীমে চলতে আল্লাহর আয়াতগুলো বিশ্বচরাচরের নানা প্রান্ত থেকে যে সিগনাল দেয় তা বুঝতে সে ব্যর্থ হবে। মুসলমানগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবিস্মরণীয় জ্ঞানী হয়েছিলেন সে সামর্থ থাকার কারণেই।

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন পাকে বলেছেন, জ্ঞানী আর অজ্ঞ ব্যক্তি কখনই এক নয় (সুরা যুমার ৯)। অন্যত্র বলেছেন, আল্লাহপাক যে ব্যক্তির কল্যান চান তার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেন (সুরা মুযাদিলা ১১)। অর্থাৎ মানুষের জন্য জ্ঞানের চেয়ে কল্যাণকর কিছু নেই। তাই নিছক সম্পদের অন্বেষণে জীবনের সামর্থ বিণিয়োগে মানবতা নেই, এটি পশুত্বের চেয়েও নীচুতে পৌছে দেয়। পশুর বাঁচাবার প্রেরণা আহার সংগ্রহ হলেও পেট পুর্ণ হলে সে আর তালাশ করে না। কিন্তু মানুষ সম্পদের পাহাড়ে বসেও আরো চায়। জ্ঞানার্জন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে মহান আল্লাহতায়ালা তার অনুগত বান্দাদের শিখিয়েছেন কি ভাবে তা জন্য প্রার্থনা করতে হবে। যেমনঃ হে রব! আমার জ্ঞানে বৃদ্ধি করে দাও (সুরা তা হা ১১৪)। আল্লাহতায়ালার শেখানো এ দোয়া থেকে এটি সুস্পষ্ট যে জ্ঞান থাকাটাই বড় কথা নয়, বরং সে জ্ঞানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়া চাই। একটি জাতিকে বিজয়ী জাতি হিসাবে টিকে থাকার জন্য এমন অবিরাম শিক্ষা (continuous education) শুরু জরূরী নয়, অপরিহার্য্যও। জ্ঞানের বৃদ্ধি যে দিন থেমে যায়, ব্যক্তির মন ও মননের পচনও সেদিন শুরু হয়। এটি অনেকটা দেহের খাদ্য গ্রহণের মত। খাদ্য গ্রহণ বন্ধ হলে ব্যক্তির জীবনে যেটি অনিবার্যরূপে আবির্ভূত হয় সেটি মৃত্যু। নবীপাক (সাঃ) এই জন্যই বলেছেন, আফসোস সেই ব্যক্তির জন্য যার জীবনে একটি দিন অতিবাহিত হলো অথচ তার ইলমে বৃদ্ধিই ঘটলো না। ইসলাম তার প্রারম্ভ থেকেই নিরবিচ্ছিন্ন জ্ঞানলাভে যে কতটা বিশ্বাসী এটি তারই প্রমাণ। ইসলামে বিদ্যার্জন শুধু পরীক্ষায় পাশ বা সার্টিফিকেট লাভের জন্য নয়, বরং আল্লাহতায়ালাকে খুশী করা বা তাঁর দরবারে নিজের মর্যাদাকে বাড়ানোর এটি হাতিয়ার। তাই মুসলমানের জন্য শিক্ষা স্বল্পকালীন নয়, এটি তার আমৃত্যু প্রচেষ্ট।

যেটি আল্লাহর নির্দেশ বা যা করলে তিনি খুশী হন, ইসলামে সেটিই ইবাদত। তাই অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত শুধু নামাজ রোযা নয়, জ্ঞানলাভও। আল্লাহর প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, কবর থেকে দোলনা পর্যন্ত

জ্ঞান লাভ কর। তিনি বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নরনারীর উপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা এভাবে আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে বিদ্যাশিক্ষাকে সার্বজনীন ও ধর্মীয়ভাবে বাধ্যতামূলক করেছিল। আর মানুষ যেহেতু তার সকল মহৎ কাজে ধর্ম থেকেই উৎসাহ পায়, ফলে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মাত্র কয়েক দশকে জ্ঞানবিজ্ঞানে অভূতপূর্ব বিপ্লব আসে। যে আরবী ভাষায় কোরআনের পূর্বে কোন গ্রন্থ ছিল না সে আরবী ভাষায় জ্ঞানের এক এক বিশাল ভান্ডার। রাসূলে পাক (সাঃ) আরো বলেছেন, একমাত্র দুই ব্যক্তিকে নিয়ে হিংসা করা যায়। প্রথমতঃ সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহপাক প্রচুর সম্পদ দান করেছেন এবং সে তা থেকে প্রচুর দান খয়রাতও করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহপাক জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনা করেন এবং তা অন্যদের শেখান (সহিহ বুখারী ও মুসলীম)।
হাদিস পাাকে আরো এসেছে, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে পথে বের হন, আল্লাহতায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন (সহীহ মুসলিম)। তিরমিযী শরিফে বলা হয়েছে, নবীপাক (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনে ঘর থেকে বের হয় সে ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অবস্থান করে। আরো বলা হয়েছে, জ্ঞানীর ঘুম একজন অজ্ঞ এবাদতকারীর চেয়ে উত্তম। যিনি ইলম শিক্ষা দেন তার জন্য আল্লাহতায়ালা রহমত নাযিল করেন। ফেরেশতাকুল, জমিন ও আসমানের বাসিন্দা, এমনকি পিপিলিকা এবং মাছও তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে (তিরমিযী শরিফ)। আর কোন ধর্মে বিদ্যাশিক্ষাকে এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছে কি? আজ বিভিন্ন দেশ বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা শিক্ষাকে সার্বজনীন করার ঘোষনা দিচ্ছ অথচ ইসলাম আজ থেকে ১৪শত বছর আগেই সেটির প্রয়োগ করেছে।

জ্ঞানার্জনকে শুধু নবীজী (সাঃ) নন, সাহাবায়ে কেরামও অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন। এবং সে গুরুত্ব যে কত গভীর ও হৃদয়স্পর্শী ছিল তা তাদের বক্তব্যে পরিস্ফুট। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, সম্পদ মানুষকে পাহাড়াদার বানায় আর জ্ঞান মানুষকে পাহাড়া দেয়। তিনি আরো বলেছেন, সম্পদ চুরী হয়, কিন্তু জ্ঞান চুরী হয় না। এটি দিলে কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়। হযরত আলী (রাঃ) সন্তানদের জন্য জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলেছেন কারণ পিতা-মাতার মৃত্যুতে বা অনুপস্থিতে একমাত্র এটিই তাদেরকে বিপথে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে।

নবীজীর (সা) আমলে মুসলমানদের মাঝে স্বাক্ষরতার তেমন ছিল না। নানা ভাষার নানা পুস্তকাদী পড়ার সামর্থও তাদের ছিল না। আল্লাহতায়ালা এ বিশ্ব জুড়ে যে গ্রন্থ খুলে রেখেছেন সেটি পাঠের সামর্থ তাদের আজকের শিক্ষিতদের চেয়ে বেশী ছিল। ফলে সেদিন যেরূপ অধিক সংখ্যক উঁচু মাপের জ্ঞানীর সৃষ্টি হয়েছিল তা মানব ইতিহাসের কোন কালেই হয়নি।

অবশ্য সেকালের মুসলমানদের বিস্ময়কর সফলতার মূল কারণ হলো কোরআনী জ্ঞান। বিশ্বের কোন জ্ঞানই তার সমকক্ষ হওয়া দুরে থাক তুলনীয়ও হতে পারে না। কারণ মানুষের সামর্থ অতি সামান্য, জ্ঞানী বা বিজ্ঞানীই হোক না কেন সে নিজেই জানে না আগামী কাল বাঁচবে কি বাঁচবে না। অপর দিকে কোরআন এসেছে সেই মহাজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা থেকে যার কাছে আসমান জমিনের দৃশ্য অদৃশ্য কোন কিছুই অজানা নয়। সেই মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ মানুষের মগজের উপযোগী করে পাঠিয়েছেন আল কোরআন। মগজকে যদি হার্ড ডিস্ক বলা যায় তবে কোরআনকে বলা যায় তার জন্য সর্বাধিক উপযোগী সফট ওয়ার। কম্পিউটার পাওয়ারফুল হলেও নিজের সাধ্য নেই কিছু করার। এমন কি দুইয়ে দুইয়ে চার হয় সেটিও মেলাতে পারে না। অথচ সফটওয়ারের কারণে যাদুকেও এটি হার মানায়। তবে এজন্য সফটওয়ারকেও হার্ড ডিস্কের উপযোগী বা পড়সঢ়ধঃরনষব হতে হয়, নইলে সেটি নিরর্থক। এজন্যই সফটওয়ারের আবিস্কারককে হার্ডডিস্কে বিশেষজ্ঞ হতে হয়। সফটওয়ার অসংখ্য প্রকারের, এবং একেকটির কাজ একেক ধরণের। কোনটি বা হিসাব-নিকাশের, কোনটি বা গ্রাফিক্সের বা কোনটি ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের। বলা মানুষের যত পেশা তত রকমের সফটওয়ার। সফটওয়ার যতই উন্নত হয় হার্ডডিস্কের কার্যক্ষমতাও ততই বৃদ্ধি পায়। এবং একই কম্পিউটারে

একাধিক সফটওয়ার ঢুকিয়ে কাজ নেয়া যায়। মানুষের মগজও তেমনি এক বিশাল হার্ডডিস্ক। এ মগজের সামর্থ কম্পিউটারের চেয়েও বিস্ময়কর। বরং কম্পিউটারের আবিস্কারক এ মগজই। তবে সে সামর্থ সর্ব ক্ষেত্রে নয়। মগজের সামর্থ কম্পিউটার আবিস্কারের মত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্ময়কর হলেও ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের তারতম্যে তথা জীবনে মুক্তির পথ রচনায় তেমনটি নয়। এ জন্যই যে মগজ কম্পিউটার আবিস্কার করতে পারে বা চাঁদে হাঁটতে জানে সে মগজ জানে না উলঙ্গতা, ফ্রিসেক্স, পর্ণোগ্রাফি, হোমোসেক্সুয়ালিটি, মদ্যপান কত বীভৎস ও ক্ষতিকর। এগুলো যে অতি আদিম অমানবিকতা সেটি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এরা জানতে পারেনি। এরূপ অজ্ঞতার প্রমাণ মেলে সামাজিক উন্নয়নের নানা মডেল আবিস্কারের মধ্যেও। এরই ফলে কম্যুনিজম, ন্যাশনালিজম, পুঁজিবাদ ও ফ্যাসীবাদের মত ভ্রান্ত মতবাদের পিছনে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ নাশ হয়। বরং সত্যতো এটাই, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে মানুষের খরচের অংক যেন বিস্ময়কর ভাবে বেড়েছে। এসব ভ্রান্ত মতবাদের প্রবক্তরা একমাত্র দুটি বিশ্বযুদ্ধেই ৫৬ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে। কম্যুনিজমের মত একটি দুষ্ট মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে লাখ লাখ মানুষকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে রাশিয়ায়, চীনে, কম্বডিয়ায়। যারা না মরে বেঁচে আছে তাদের বাঁচাটিও এরা শান্তিতে হতে দিচ্ছে না। এদের সৃষ্ট নানা ভ্রান্ত ধারণার কারণে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠান পরিবার প্রথা প্রাশ্চত্য দেশগুলোতে আজ বিদ্ধস্থ, এবং এটি মহামারি রুপে ছড়িয়ে পড়ছে প্রাচ্যেও। ফলে বিপদে আপদে, সুখে দৃঃখে অসহায় মানুষ যে পরিবারে হাজার হাজার বছর ধরে আশ্রয় পেয়েছে সেটি থেকে আজ বঞ্চিত।

বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষের ভোগের সামগ্রী বাড়লেও আনন্দের বা শান্তির সামগ্রী বাড়েনি। ফলে মুক্তি পাচ্ছ না মানবতা। এককালে যে হীংস্রতা নিয়ে বনের হীংস্রপশু গুলো হামলা তার চেয়েও বেশী হীংস্রতা নিয়ে হামলা করছে মনুষ্যরূপী পশুরা অন্য মানুষের উপর। ফিলিস্তিন, বসনিয়া, কসভো, কাশ্মীর এবং সম্প্রতি চেচনিয়াতে মানুষরূপী দানবেরা যে হীংস্রতা দেখাচ্ছ তা কি বন্য পশুর চেয়ে কম হীংস্র? জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ জন্য যে এটি মানবের এসব হীংস্র প্রবৃত্তিগুলোকে দমিত করবে। কিন্তু এটি এখন নিজেই সে রোগে আক্রান্ত। গণহত্যার সাথে জড়িত এখন এ প্রতিষ্ঠানটিও। বসনিয়ার সেব্রেনিৎসাতে তারা যেভাবে হাজার হাজার অসহায় মানুষকে সার্বদের বধ্য ভূমিতে যেতে বাধ্য করেছ তা কেবল নাৎসী পশুদের সাথেই তুলনীয়। এটি এখন জাতিসংঘের নিজস্ব রিপোর্টে থেকেই প্রমানিত।

কিন্তু কেন এ ব্যর্থতা? বিজ্ঞানের এত অগ্রগতির মাঝেও মানব জাতি কেন শান্তির পথ থেকে এত দূরে? এর কারণ এটি নয় যে তারা কারিগরী জ্ঞান বা কলাকৌশলে দূর্বল। এর মূল কারণ, শান্তির লক্ষে আল্লাহতায়ালা মগজের উপযোগী যে সফটওয়ার দিয়েছিলেন মানুষ সেটিকে কাজেই লাগায় নি। ফলে শান্তির বদলে অশান্তিও বেড়েছে। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত সফটওয়ারের প্রয়োগে আরবের মরুবাসী নিরক্ষর বেদুঈনরা সেদিন শান্তি ও মানবতার বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করতে পেরেছিলেন। জ্ঞানার্জনের বেলায় এ মৌল বিষয়টি গুরুত্ব অবশ্যই বুঝতে হবে।

বাংলাদেশের মত দেশগুলোতে শিক্ষার নামে যা হয়েছে তাতে কুশিক্ষার পরিমাণই অধিক। ফলে দেশে স্কুল বাড়ছে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ছে কিন্তু আলোকিত মনের মানুষ বাড়ছে না। বরং নব্য শিক্ষিতরা বীভৎস পাপাচারে মুর্খদেরও হারিয়ে দিয়েছ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণে সেঞ্চুরী হয় এবং সে সাথে উৎসবও হয় এটি তারই প্রমান। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরীর হাতিয়ার বানাতে চায়। এরূপ সম্পূর্ণ মানুষই ইসলামী পরিভাষায় ইনসানে কামেল। ইনসানে কামেল অর্থ খানকার দরবেশ নয় বা কোন পীর সাহেব নন। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থায় একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের কোন একটি শাখায় বিস্তর জানলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞতা নিয়ে বেড়ে উঠে ধর্মকে নিয়ে। ধর্ম বিষয়ে তার অজ্ঞতা ২ বা ৩ হাজার বছর পুরোন আদিম মানুষের চেয়ে কম নয়। এজন্যই ভারতের একজন সেরা বিজ্ঞানী শাপ, গাভী বা মাটির পুতুলকে ভগবান ভেবে পূঁজা দিতে পারে। তেমনি

পাশ্চাত্য দেশের নোবেল বিজয়ী একজন বিজ্ঞানী যীশু কে আল্লাহর পুত্র ভাবতে পারে। অপরদিকে মাদ্রাসার ছাত্র বেড়ে উঠছে বিজ্ঞানের অনেক মৌল বিষয়ের উপর সীমাহীন অজ্ঞতা নিয়ে। জ্ঞানার্জনের এ অতি দূর্বল পদ্ধতি মানুষকে অতিশয় অপূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তুলছে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে চায় পূর্ণাঙ্গ বা কামেল করতে। আজকের আলেমদের ন্যায় নবীজীর যুগের মুসলমানেরা অপূর্ণাঙ্গ বা নাকেছ ছিলেন না। তারা যেমন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন, তেমনি ছিলেন সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, জেনারেল এবং রাজনীতিবিদ। তারা যেমন মসজিদেও নামাজে আওয়াল ওয়াক্তে হাজির হতেন তেমনি যুদ্ধের ময়দানেও ফ্রন্ট লাইনে থাকতেন। জীবনে বহুবার তারা যুদ্ধ করেছেন। অথচ আজকের আলেমদের ক'জন তাদের ৪০, ৫০, ৬০ বা ৭০ বছরের জীবনে একটি বারের জন্যও শত্রুর বিরুদ্ধে একটি তীর ছুঁড়েছেন? এর কারণ তারা বড়ই অপূর্ণাঙ্গ। ইলমের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গতা বিধানে নবীজী (সাঃ) কোরআন-হাদিসের বাইরেও জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করেছেন। জ্ঞানার্জনে প্রয়োজনে চীন দেশে যাও - সেটি সম্ভবতঃ এজন্যই। এমনকি নবীজী (সাঃ) নিজেও শিখেছেন অন্যদের থেকে। যেমন খন্দকের যুদ্ধে পরীখার কৌশল শিখেছিলেন ইরানী সাহাবা সালমান ফারসী থেকে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা সেকালে গ্রীক ভাষা শিখেলিলেন। এরিস্টোটল, প্লেটো সহ বহু গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের গ্রন্থকে তারা অনুবাদ করেছিলেন। অনেকে ভারতের ভাষা শিখে হিন্দু বিজ্ঞানীদের বহু বইপুস্তক তরজমা করেছিলেন। সেটি ছিল মুসলমানদের গৌরব কাল। অবশ্য সে গৌরব এসেছিল জ্ঞানের ভূবনে অগ্রসর হওয়ার কারণে। অথচ আজ তেমনটি হচ্ছ না। কারণ, যে জ্ঞান জাতিকে সামনে টেনে নেয় সেটির চর্চাই লোপ পেয়েছে। ক'জন আলেম আজ জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট? তাছাড়া জ্ঞানার্জনের একটি মাত্র মাধ্যম হলো পড়ে শিখা। এছাড়া আরো অনেক মাধ্যম রয়েছে। সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো ছাত্রদের ভাবতে বা চিন্তাতে অভ্যস্থ্য করা। চিন্তার সামর্থ ব্যক্তির ভিতরে জেনারেটরের কাজ করে। এটি চালু হলে ব্যক্তিও অভ্যন্তরে তখন জ্ঞানের দুর্দমনীয় ক্ষুধা সৃষ্টি হয়। সে ক্ষুধা দমনে সে পাহাড় পর্বত,নদী-সমুদ্র কোন কিছু অতিক্রমেই আর পিছপা হয় না। যে পাঠ্য পুস্তক বা শিক্ষকের যে বক্তৃতা ছাত্রকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে না তা কি আদৌ জ্ঞানার্জনে সহায়ক? এতে সার্টিফিকেট লাভ সহজতর হলেও তাতে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়ে না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজই হলো ছাত্রের মনে জ্ঞানের প্রতি নেশা ধরিয়ে দেওয়া যা তাকে আজীবন জ্ঞানপিপাসু করবে। কিন্তু মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা পারিনি। ফলে বাড়েনি জ্ঞানের প্রতি সত্যিকার আগ্রহ। এমন জ্ঞান বিমুখীতাই একটি জাতির পতন ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট নয় কি? উড়বার প্রয়োজনে পাখীর দুটো ডানাই যেমন সবল ও সুস্থ থাকা উচিত, তেমনি সুস্থ সভ্যতার নির্মানে অপরিহার্য প্রয়োজন হলো ইসলাম ও বিজ্ঞান - এ দুটো শাখাতেই ভারসাম্যমূলক অগ্রগতি। কিন্তু সেটি হয়নি। পাশ্চাত্য সমাজ আজ ধর্মবিবর্জিত যে শিক্ষার কারণে বিপর্যয়ের মুখে, আমরা সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় সেদিকেই ধাবিত হচ্ছি। ধ্বংসমুখী এ জাতির উথানে আমাদের সামনে একটিই পথ। সেটি হলো, আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৪ শত বছর পূর্বের সেই প্রেসক্রিপশনে। সেদিন ইকরা বা জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে যেভাবে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজও আমাদের সেভাবেই শুরু করতে হবে। তবে সবচেয়ে আশার বাণী হলো এ পথ পরীক্ষিত পথ, কোন ব্যর্থতার নজির নেই। বিশ্বের অন্যসব জাতি থেকে অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মানব ইতিহাসের শুরু থেকে এ অবধি অন্যরা লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তক্ষয়ে শুধু ব্যর্থতারই ইতিহাস গড়লেও একমাত্র মুসলমানদেরই রয়েছে নির্ভেজাল সফলতার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। বস্তুতঃ মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার নির্মান হয়েছিল এ পথেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর পরও কি মুসলমানেরা তাদের সে নিজস্ব পথে ধাবিত হবে না?

প্রশ্নঃ

১. আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের মত দেশ স m দে অতি দরিদ্র। অথচ আপনি বলছেন জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। এত অপ্রতুল সম্পদ নিয়ে আমরা কি সবার জন্য জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করতে পারবো?

২. মুসলিম দেশ গুলোতে শিক্ষার হার যথেষ্ট বেড়েছে, মাদ্রাসাও প্রচুর হয়েছে তার পরও কি বলা যায় যে জ্ঞানার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি?

৩. পাশ্চাত্য সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞানে যথেষ্ঠ এগিয়েছে কিন্তু এর পরও কি আপনি কি উন্নত সভ্যতা বলতে রাজি না?

৪. আমরা দেখতে পাR শুধু জ্ঞানে নয়, মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্খলন অতি ব্যাপক। কিন্তু এগুলীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞতাকে কেন এত গুরুত্ব দিচেছন?